BLACK ICE
SOFTWARE INC.
Driver Demo

ইসলামের শত্রুদের ছলচাতুরী

-মুহাম্মাদ খালিদ সাইফুল্লাহ রিয়াদ

ভূমিকাঃ এই পৃথিবীতে দুটি পক্ষ-- আল্লাহপন্থী এবং আল্লাহবিরোধী। কিন্তু খুব কম লোকই আছে নিজেদের আল্লাহদ্রোহিতার কথা জনসমক্ষে প্রকাশ করে। যারা আল্লাহবিদ্বেষী, তারা আল্লাহর প্রতি শত্রুতা চরিতার্থ করার জন্য সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হবার পরিবর্তে নানারূপ বক্র ও কুটিল পন্থার আশ্রয় নিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের ছদ্মাবরণে নিজেদের মতলব হাসিল করাই তাদের স্ট্রাটেজী। নিজেরা সত্য ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করা, মানুষকে সত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা এবং সত্যপন্থীদের সাথে শত্রুতা করার জন্য বাতিলপন্থীরা নানারকম ছলছাতুরীর আশ্রয় নেয়। ইসলামের শত্রুদের আসলে কোন ধর্ম নেই, কেবল নিজ নিজ ধর্মকে রক্ষার নামে ইসলামের বিরোধিতা করাটাই তাদের উদ্দেশ্য। অমুসলিম জাতিগুলোর কর্ণধাররা স্বজাতির জনগণকে উত্তেজিত করার কৌশল এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা করার অযুহাত হিসেবেই ধর্মকে ব্যবহার করে। এছাড়া মুসলিম ছদ্মবেশধারী মুনাফিকরাও ইসলাম ও মুসলমানদের ঘায়েল করার জন্য খোদ ইসলাম রক্ষার দাবিকেই হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। ধর্ম নিয়ে ধর্মদ্রোহীদের এসব ভণ্ডামী ও প্রতারণা নিয়েই আমাদের এ আলোচনা।

সত্য ধর্মের মোকাবেলায় বাতিলপন্থীরা যে সমস্ত ওজর-আপত্তি ও কলাকৌশল অবলম্বন করে থাকে সেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করব। তাদের যাবতীয় নীতি-কৌশল ও পলিসি সাধারণত ধর্মের নামেই পরিচালিত হয়। ধর্মের নামে ধর্মদ্রোহিতা আবার বিভিন্ন পন্থায় হয়ে থাকে। (১) ইসলামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য অন্যান্য বাতিল ধর্মকে সত্য ধর্ম বলে প্রচার করা এবং সেই ধর্মগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা; (২) ইসলামকেই ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা বা নিজেদের ইসলামবিরোধী মতবাদ, কার্যকলাপ ও তৎপরতাকে ইসলামের দ্বারাই জাস্টিফাই করা; (৩) ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের দ্বীন-ঈমানের উন্নতি সাধনের নামেই এমন কাজ করা যাতে ইসলাম তথা মানুষের দ্বীন-ঈমান বিপন্ন হয়; (৪) প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও মানুষের দ্বীন-ঈমানের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন এবং গোপন চক্রান্ত ও তৎপরতার মাধ্যমে ইসলাম তথা মানুষের দ্বীন-ঈমানকে বরবাদ করা। প্রথমটি হচ্ছে বিধর্মীদের পলিসি, আর বাকিগুলো মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের পলিসি। প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ছলচাতুরী করা হয়, আর শেষেরটির ক্ষেত্রে গোপনে অনিষ্ট করা হয়।

(১) ইসলামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য অন্যান্য বাতিল ধর্মকে সত্য ধর্ম বলে প্রচার করা এবং সেই ধর্মগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করাঃ আমরা জানি, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য যে দ্বীন বা জীবন বিধান প্রদান করেছেন তা মূলত একই। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর কাছেই আল্লাহ একই তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতের পয়গাম পাঠিয়েছেন, একই ধর্মের বাণী প্রদান করেছেন। কিন্তু বিভিন্ন নবীর কওমের লোকদের মধ্য থেকে কায়েমী স্বার্থবাদীরা মূল দ্বীনকে বিকৃত করে নিত্য নতুন ধর্মের জন্ম দিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট নবীগণকেই সেই সমস্ত ধর্মের প্রবর্তক হিসেবে জাহির করেছে। তাদের সৃষ্ট এসব বিকৃতির কবল থেকে মূল দ্বীনকে উদ্ধারের জন্য পরবর্তীতে যখনই কোন নবী-রাসূল আগমন করেছেন, তখনই তারা তাদের সেই মনগড়া দ্বীনকে পূর্ববর্তী নবীর দ্বীন সাব্যস্ত করে সেই নবীর অনুসরণের নামে নতুন নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে। আমাদের আখেরী নবীর (সাঃ) বিরোধিতার ক্ষেত্রেও তারা একেক দল পূর্ববর্তী একেক জন নবীর নাম ব্যবহার করেছে, নিজেদেরকে সেই নবীদের ধর্মের অনুসারী বলে দাবি করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা নবীগণের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে ধর্মের নামে নিজেরা বিধান রচনা করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সত্য ধর্মের আকীদা-বিশ্বাসের মতবিরোধ দেখা দেয় এবং এ মতবিরোধকে উসিলা করেই তারা সত্য দ্বীনের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণ মনগড়া ধর্ম তৈরি করার পরিবর্তে সত্য ধর্মেরই মাথা কেটে লেজ জুড়ে একটা জগাখিচুড়ি মার্কা দাড় করায়, যাতে সেটাকে সত্য ধর্ম বলে মানুষকে ধোঁকা দিতে সুবিধা হয়। ধর্মমত রচনার ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর দ্বীনকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করার পরিবর্তে দ্বীন ও ঈমানের মৌলিক বিষয়বস্তু ও নীতিমালার মধ্য থেকে কোন কোনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন আর কোন কোনটিকে সত্য বলে মেনে নেয়ার এক চাতুর্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে। কারণ তারা ভাল করেই জানে, একটা দালান ভূপাতিত করার জন্য সবগুলো ভিত্তি গুঁড়িয়ে দেয়ার প্রয়োজন হয় না, যেকোন একটা ভিত্তিকে সরিয়ে দেয়াই যথেষ্ট। এজন্য তারা কখনো আল্লাহকে নিয়ে বিতর্ক করে, আবার কখনো পরকাল, নবী-রাসূল, আসমানী কিতাব বা ফেরেশতাদের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন করে। কেউ হয়ত আল্লাহকে স্বীকার করে, কিন্তু বাদবাকি সব অস্বীকার করে। কেউবা আবার আল্লাহ ও আখেরাতকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু নবুওয়াত-রিসালাত ও আসমানী কিতাবকে প্রত্যাখ্যান করে। অনেকে আবার নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব মানার দাবি করলেও ফেরেশতাদের ব্যাপারে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এভাবে তারা সত্য দ্বীনের মধ্য থেকে কিছু বিষয় গ্রহণ করে, আর কিছু বর্জন করে। শুধু তাই নয়, যে বিষয়গুলো গ্রহণ করে তার মধ্যেও আবার কিছু অংশ রেখে দেয়, আর কিছু অংশ ফেলে দেয়। কাফেরদের মধ্যে যারা আল্লাহকে মানার দাবি করে তারা শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেয়, আল্লাহর সিফাতসমূহ ও একত্বকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। এছাড়া আল্লাহকে কেবল সৃষ্টিকর্তা হিসেবেই স্বীকার করে, কিন্তু তাঁর হুকুম-আহকামের বিরোধিতা করে। যারা নবুওয়াত ও রিসালাত মান্য করে, তারাও সকল নবীকে মেনে নেয়ার পরিবর্তে কয়েকজনকে স্বীকৃতি দেয় আর কয়েকজনকে প্রত্যাখ্যান করে। তদুপরি যারা যে নবীকে মানার দাবি করে তারা সে নবীর অনুসরণের ব্যাপারেও কিছু ক্ষেত্রে আনুগত্য করে, আর কিছু ক্ষেত্রে অবাধ্যতা প্রদর্শন করে। আবার যারা ফেরেশতাদের অস্তিত্ব স্বীকার করে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ফেরেশতাদের নামে অনেক অসঙ্গত ধারণা পোষণ করে, আর কেউ কেউ ফেরেশতাদের মধ্যে একজনকে মিত্র আরেকজনকে শত্রুরূপে গণ্য করে। তারা এমন একজন ফেরেশতাকে প্রত্যাখ্যান করে, যাকে বাদ দিলে আল্লাহ এবং সকল নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, আল্লাহর সাথে নবীগণের যোগসূত্রই ছিন্ন করে দেয়া হয়। যারা আসমানী কিতাবে বিশ্বাসের দাবি করে তারাও কোন কোন কিতাবকে মানে, আর অন্যান্য কিতাবকে অস্বীকার করে এবং যে কিতাবকে মানে তার মধ্যেও কিছু অংশ গ্রহণ করে ও বহাল রাখে, আর কিছু অংশ অমান্য বা গোপন ও বিকৃত করে। ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করার পাশাপাশি ধর্মদ্রোহীদের আরো একটি কৌশল হচ্ছে ধর্মের সাথে কিছু সংযোজন করা-- ধর্মকে ভেজালযুক্ত করার মাধ্যমে ধর্মের বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ন করা। আল্লাহতে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তারা আল্লাহর সাথে আরো একাধিক খোদা জুটিয়ে নেয়, এমনকি আল্লাহর সন্তান-সন্ততিও আবিষ্কার করে। পরকালে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পুনরুত্থানের সাথে পুনর্জন্মকেও অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। নবী-রাসূলে বিশ্বাসের

ক্ষেত্রে অনেক নবী-রাসূলকে আল্লাহর মর্যাদায় উন্নীত করে। কিতাবে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাবের মাঝে নিজেদের মনগড়া সূরা বা আয়াত সংযুক্ত করে দেয়।

বিধর্মীদের এসব ছলচাতুরী ও দ্বিমুখী নীতির কথা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তুলে ধরা হয়েছে। নবী-রাসূলে বিশ্বাসের ব্যাপারে ইহুদী-খ্রীস্টানদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রসঙ্গে আল কুরআনে বলা হয়েছে, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী তদুপরি আল্লাহ ও রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাসে তারতম্য করতে চায় আর বলে যে, আমরা কতককে বিশ্বাস করি কিন্তু কতককে প্রত্যাখ্যান করি এবং এরই মধ্যবর্তী কোন পথ অবলম্বন করতে চায়। আসলে এরাই পাকা কাফের। আর কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি অপমানজনক আযাব।" (সূরা নিসাঃ১৫০,১৫১) অর্থাৎ, তারা আল্লাহ ও কয়েকজন নবী-রাসূলকে মানার কথা বললেও আসলে তারা আল্লাহকে বা কোন নবী-রাসূলকেই মানে না। ইহুদীরা কেবল নিজেদের বংশের নবীগণকে নবী বলে স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে মূসা নবীর অনুসারী বলে দাবি করত। তাদের এ দাবির মোকাবেলায় আল কুরআনে এরশাদ হচ্ছে, "যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা পাঠিয়েছেন তা মেনে নাও, তখন তারা বলে, আমরা মানি যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে। সেটি ছাড়া সবগুলোকে তারা অস্বীকার করে। অথচ এ গ্রন্থটি সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের যা তাদের কাছে রয়েছে। বলে দিন, তবে তোমরা ইতিপূর্বে পয়গম্বরদের হত্যা করতে কেন যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক।" (বাকারাঃ৯১) ইহুদীরা কুরআন প্রত্যাখ্যানের পক্ষে যুক্তি দেখাত যে, তা তাদের মধ্যকার কারো উপর নাযিল হয়নি, অর্থাৎ মুহাম্মাদ (সাঃ) তাদের বংশের কেউ নন। তাদের এ ওজর খণ্ডনের জন্য আল্লাহ তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, তারা নিজেদের বংশের অনেক নবীকেও হত্যা করেছিল। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা মূলতঃ কোন নবী ও কিতাবেরই ধার ধারে না, কেবল একটির মোকাবেলায় অপরটিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। আল্লাহর নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের প্রতি তাদের অস্বীকৃতি ও কুফরী মনোভাবের ব্যাপারে স্বয়ং তাদের স্বীকারোক্তিও পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে এরশাদ হচ্ছে, "তারা আল্লাহকে যথার্থ মূল্যায়ন করতে পারেনি, যখন তারা বললঃ আল্লাহ কোন মানুষের প্রতি কোন কিছু অবতীর্ণ করেননি। আপনি জিজ্ঞেস করুনঃ ঐ কিতাব কে নাযিল করেছে, যা মূসা নিয়ে এসেছিল? যা জ্যোতিবিশেষ এবং মানবমণ্ডলীর জন্য হেদায়েতসরূপ, যা তোমরা বিক্ষিপ্তপত্রে রেখে লোকদের মধ্যে প্রকাশ করছ এবং বহুলাংশে গোপন করছ।" (আনআম) এমনকি মক্কার পৌত্তলিকরাও মুহাম্মদ (সাঃ)-কে প্রত্যাখ্যানের বাহানা হিসেবে মূসা (আঃ)-এর দোহাই দিত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, "অতঃপর আমার কাছ থেকে যখন তাদের কাছে সত্য আগমন করল, তখন তারা বলল, মূসাকে যেরূপ দেয়া হয়েছিল, এই রাসূলকে সেরূপ দেয়া হল না কেন? পূর্বে মূসাকে যা দেয়া হয়েছিল, তারা কি তা অস্বীকার করেনি? তারা বলল, উভয়ই জাদু, পরস্পরে একাত্ম। তারা আরো বলল, আমরা প্রত্যেকটিই প্রত্যাখ্যান করছি।" (সূরা কাসাসঃ৪৯) অর্থাৎ, তারা মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে জব্দ করার জন্য দোহাই দিয়েছিল যে, কুরআন কেন তাওরাতের মত একবারে নাযিল হয়নি অথবা মূসা (আঃ)-এর মত মোজেজা কেন আখেরী নবীকে দেয়া হয়নি। অথচ তারা মূসা (আঃ) ও তাওরাতসহ সকল নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবকেই ইতিপূর্বে প্রত্যাখ্যান করেছে, তারা মূলত নবুয়ত ও রিসালাতেই বিশ্বাসী নয়। ইহুদীরা কেবল আসমানী কিতাবের মধ্যে একটি বাদে বাকিগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং যে কিতাবটিকে মেনে নেয়ার দাবি করেছে সেই কিতাবটির মধ্যেও কিছু বিধান মেনে নিয়ে বাকি বিধানগুলো অগ্রাহ্য করেছে। যেটুকু মেনে নিয়েছে তাও আবার আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নয়, কেবল নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তাদের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করেন, "যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা পরস্পর খুনাখুনি করবে না এবং নিজেদেরকে দেশ থেকে বহিস্কার করবে না, তখন তোমরা তা স্বীকার করেছিলে এবং তোমরা তার সাক্ষ্য দিচ্ছিলে। অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করেছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্তি দিচ্ছ। অথচ তাদের বহিস্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশ অবিশ্বাস কর! যারা এরূপ করে, পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনই পথ নেই। আর কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।" (সূরা বাকারাঃ৮৪,৮৫) অর্থাৎ, তাওরাতের বিধানমতে শত্রুপক্ষের কেউ যুদ্ধবন্দী হলে তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়ার অনুমতি ছিল। কিন্তু বনী ইসরাইলীদের নিজেদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। অথচ ইহুদীরা নিজেরাই একদল আরেক দলকে শত্রুপক্ষ বলে বিবেচনা করে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল এবং সেক্ষেত্রে যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে অর্থ আদায় করত। আর সেই মুক্তিপণ আদায়কে তাওরাতের দোহাই দিয়ে জাস্টিফাই করত। অর্থাৎ, তারা অর্থ ও ক্ষমতার লোভে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হত-- কাজ করত নিজেদের স্বার্থের জন্য, আর রেফারেন্স দিত তাওরাতের। কিন্তু তারা যদি আল্লাহর কিতাবের অনুসারী হতো, তাহলে কিতাবের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্বজাতির ভাইদেরকে খুন-খারাবি করে তাড়িয়ে দিত না, বন্দীও করত না।

দ্বীনের দুশমনরা দ্বীনের মাঝে নানারকম বিকৃতি ও বিভক্তি আরোপ করে নিজ নিজ ধর্মমত ও রাজনৈতিক দর্শনকে সে অনুসারে ঢেলে সাজায়। তারা নিজেদের আবিষ্কৃত বিকৃত চিন্তাধারাকেই ধর্ম বলে চালিয়ে দেয় এবং তাকে পুঁজি করেই সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত হয়। তারা নিজেদের স্বার্থ ও খেয়ালখুশীমত ধর্মকে ঢেলে সাজায়, নানাভাবে ধর্মের মাঝে বিভক্তি আরোপ করে এবং ধর্মের সেই খন্ডিত, বিকৃত ও সংকীর্ণ রূপকেই ধর্ম বলে মানুষের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। এ কাজ করতে গিয়ে তারা স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে প্রকৃত অবিকৃত সত্য ধর্মের অনুসারীদের সাথেই শত্রুতায় লিপ্ত হয়। আর ধর্মের নামেই যাবতীয় ধর্মদ্রোহী কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। ইহুদী-খৃষ্টানরা নিজেদের ধর্মীয় দাবির কথা বলে বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর জবরদখল প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিজেদের ধর্মীয় পবিত্র স্থান বলে নয়, বরং মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা, ধর্ম পালনে বাধাদান করা এবং মুসলমানদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হওয়াই তাদের উদ্দেশ্য। পবিত্র স্থানের প্রতি ভালবাসা থাকলে তারা সেখানে আগুন লাগাতে পারত না। মূর্তিপূজারী কাফের-মুশরিকরাও রাজনৈতিক প্রয়োজনে মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্য নিজেদেরকে আল্লাহর এবাদতকারী হিসেবে জাহির করে। মক্কার পৌত্তলিক নেতারা বাপ-দাদার ধর্ম রক্ষার নামে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অত্যাচার করত, সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকেই ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে কোণঠাসা করতে চাইত। তারা ঈমানদারদের মোকাবেলায় নিজেদেরকেই আল্লাহর পথের অনুসারী হিসেবে দেখাতে চাইত এবং আল্লাহর নবীর বিরুদ্ধে আক্রমণ অভিযানকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত বলে প্রমাণ করতে চাইত। কাফেরদের বাহিনী মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নেয়ার পর মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে আবু জেহেল প্রমুখ বায়তুল্লাহর পর্দা ধরে প্রার্থনা করেছিল, "ইয়া আল্লাহ! উভয় বাহিনীর মধ্যে

যেটি বেশী হেদায়েতের উপর রয়েছে এবং উভয় দলের মধ্যে যেটি বেশী ভদ্র ও শালীন এবং উভয়ের মধ্যে যে ধর্ম উত্তম তাকেই বিজয় দান কর।" আজও আবু জেহেলের উত্তরসূরীরা ঈশ্বরের ইচ্ছা পূরণের নামে ঈমানদারদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর স্রষ্টার অনুগত বান্দাদের সম্পর্কে প্রচার করে যে, "ওরা ঈশ্বরের পথে পরিচালিত মানুষ নয়, বরং শয়তানের অনুসারী।"

(২) ইসলামকেই ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা বা নিজেদের ইসলামবিরোধী মতবাদ, কার্যকলাপ ও তৎপরতাকে ইসলামের দ্বারাই জাস্টিফাই করাঃ এ পলিসি হচ্ছে মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের। তারা নিজেদের পেশকৃত খন্ডিত ও বিকৃত ইসলামকেই বিশুদ্ধ ইসলাম বলে প্রচার করে এবং তাদের নির্দেশনা ও অনুমোদনের বাইরে ইসলামের যত বিধি-বিধান আছে সেগুলোকে ইসলামের বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা ক্ষুণ্নকারী হিসেবে চিহ্নিত করে। তারা দ্বীন ইসলামকে সত্য বলে স্বীকার করলেও এর স্থায়িত্ব ও সার্বজনীনতাকে অস্বীকার করে। ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করা এবং ধর্মের সাথে নিজেদের ইচ্ছামত সংযোজন-বিয়োজন করার যে পলিসি অমুসলিমরা অবলম্বন করে, মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের মধ্যেও সেই একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তারা দ্বীন ইসলাম তথা আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের কিছু অংশ স্বীকার করে, আর কিছু অংশ অস্বীকার করে। এমনকি কুরআনের আয়াতের মূল বক্তব্যের অর্থ বিকৃতি ঘটিয়ে হলেও নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়; আর কোন সুস্পষ্ট আয়াতও নিজেদের মতের বিরুদ্ধে হলে সেই আয়াতকে মনসুখ বা রহিত সাব্যস্ত করে-- আয়াতের বিধানকে কেবল অবতরণকালের মাঝে সীমিত করে দেয় এবং বর্তমান আধুনিক যুগের ক্ষেত্রে অনুপযোগী বলে আখ্যায়িত করে। তারা আল্লাহর বিধানের মধ্য থেকে নিজেদের ব্যক্তি বা শ্রেণী স্বার্থ কিংবা রাজনৈতিক অবস্থানের সাথে যেটুকু খাপ খায় সেটুকুই গ্রহণ করে, আর বাকি সব বর্জন করে। তাদের মধ্যে কেউ আছে নিজেদের রাষ্ট্রীয় ও রাজনৈতিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুফরী বিধান অনুসরণ করে, আর কুরআনের বিধানকে ব্যক্তিগত জীবনের কতিপয় ক্ষুদ্র গণ্ডির মাঝে বন্দী করে রাখে। আবার কেউ আছে রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য খুব পেরেশানি দেখায়, কিন্তু ইসলামের মৌলিক এবাদতগুলোই বর্জন করে। তাদের যুক্তি হল, ইসলামী শাসন না থাকলে জুমা ও জামাতে নামায আদায় করা সঙ্গত নয়। অথচ জুমার আযান শুনতে পেলেই মসজিদের পানে ছুটে যাওয়া কুরআনের নির্দেশ। ইসলামী রাষ্ট্র না হলে জুমার নামায পড়া যাবে না এমন কোন বিধানের কথা কুরআনে উল্লেখ নেই। আযান যেখানে শোনা যায়, সেখানে সময় ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্য কোন অযুহাত দেখিয়ে যারা জুমার নামায বর্জনের ফতোয়া দেয়, তারা মূলতঃ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে রাখারই ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত। জুমার নামায আর ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা দুটোই কুরআনের বিধান। যে বা যারাই এর একটির পক্ষে ও অপরটির বিপক্ষে অবস্থান নেবে, একটির অযুহাতে অপরটিকে স্থগিত রাখতে বলবে, তারা মূলত আল্লাহর কুরআনকে খন্ড-বিখন্ড করতে চায় বলেই প্রতীয়মান হবে। শুধু রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান বা ধর্মীয় এবাদত-বন্দেগি নয়, আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও মুনাফিকরা কুরআনের বক্তব্যের বিপরীত অনেক ধ্যান-ধারণা প্রচার করে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা যাদের প্রতি সন্তুষ্টি ও মাগফেরাতের সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন তাদের প্রতি শত্রুতা ঘোষণা করে, তাদের নামে নানারকম অপবাদ রটনা করেও যদি কেউ নিজেকে কুরআনের অনুসারী দাবি করে, তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী প্রতারক আর কেউ হতে পারে না। সে এমন ভাব দেখায় যে, সাহাবী আর খলীফারাই সব ইসলামকে ডুবিয়ে গেছে, আমি এসেছি সেই ইসলামকে পুনরুদ্ধার করতে। অথচ সে মোটেই ইসলামের দরদী নয়; বরং অন্তরে আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, ইসলাম সবকিছুর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। সে রাসূলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ তুলে সাহাবীদের প্রতি বিষোদগার করলেও আসলে রাসূলের প্রতি নিজের ভালবাসার কারণে সাহাবীদের সাথে শত্রুতা করে না, বরং রাসূলের প্রতি শত্রুতার কারণেই সাহাবীদের সাথে শত্রুতা করে। তার মত লোকদের সম্পর্কেই আমাদের নবী (সাঃ) বলে গেছেন, "যে তাদের (সাহাবীদের) সাথে শত্রুতা করে, সে আমার সাথে শত্রুতার কারণেই তাদের সাথে শত্রুতা করে।" এককথায়, মুনাফিকরা আল্লাহর কিতাবের যাবতীয় বিধি-বিধান, আদেশ-নিষেধ, বর্ণনা-বিবরণ ও অভিমতের মধ্য থেকে নিজেদের খেয়াল-খুশীমত যেটা ইচ্ছা গ্রহণ করে আর যেটা ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামের অখন্ডতা বিনষ্ট করার পাশাপাশি এর বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ন করার ব্যাপারেও মতলববাজরা সক্রিয় রয়েছে, যারা নিজেদেরকে মুসলিম পরিচয় দিয়ে ইসলামের নামেই কাজ করে। তারা দ্বীনের আক্বীদার মধ্যে এমন কিছু সংযোজন করতে চায়, যা আমাদের দ্বীনের মৌলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তারা কেউ নবী-রাসূলগণের তালিকায় নতুন মানুষের নাম যুক্ত করে, আবার কেউ অন্য কোন ধর্মীয় পদের মর্যাদাকে নবুয়তের মর্যাদার ঊর্ধ্বে উঠিয়ে দেয়। মুনাফিকরা নিজেরা যেমন আল্লাহর দ্বীনকে পুরোপুরি গ্রহণ করার পরিবর্তে কিছু মেনে নেয় আর কিছু অমান্য করে, তেমনি মুসলিম জনগণকেও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন মেনে চলতে দেয় না, বরং তাদের মত বিচ্ছিন্নতাবাদী পলিসি গ্রহণে বাধ্য করে, ধর্মের কিছু বিষয়কে মানার অনুমতি দিয়ে বাদবাকি বিষয়গুলো গ্রহণ ও পালনের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর কারণ হলো, ধর্মদ্রোহীরা যেহেতু ধর্মকে আফিমতুল্য মনে করে, তাই আফিমের নেশা যেমন একবারে ছাড়ানো যায় না, সীমিত মাত্রায় বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে ছাড়াতে হয়; তেমনি তারা মানুষের ধর্মের প্রতি ভালবাসা দূর করার জন্য ক্ষেত্রবিশেষের উপর কিছু বিধি-নিষেধ আরোপের মাধ্যমে ধীরে ধীরে মানুষের গোটা জীবন পদ্ধতিকেই ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত করতে চায়। তদুপরি ধর্মকে যদি প্রতিটি বাস্তব ও কার্যকর ক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা যায়, তাহলে ধর্ম আপনাআপনি গুরুত্বহীন হয়ে পড়বে-- বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে না আসায় মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতাও হারিয়ে ফেলবে। মুনাফিকরা ধর্মের ব্যাপারে নিজেদের মনগড়া পলিসিকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলে আখ্যায়িত করে, যা মূলত ধর্মবিরোধিতারই ছদ্মনাম। ইসলামকে উৎখাত করে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার জন্য তারা ইসলামের নামেই অগ্রসর হয়। ইসলামকে রক্ষার নামেই ইসলামের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার নামে একে রাজনীতির ঊর্ধ্বে রাখার কথা বলে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে ইসলামী শক্তিকে বিদায় করতে চায়। তারা ইসলামী শক্তিকেই ইসলামের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারীরূপে চিহ্নিত করে এবং নিজেদের কার্যকলাপকে ইসলামের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম বলে প্রচার করে। প্রকৃতপক্ষে যারা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়, ইসলামের অনুসারীদের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়, সর্বোপরি ইসলামকে ধ্বংস করতে চায়, ইসলামের ভাবমূর্তি নষ্ট করা তো তাদেরই কাজ। শান্তির ধর্ম ইসলামকে সন্ত্রাসের ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করা তো তাদেরই উদ্দেশ্য, যারা নিজেরা সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটিয়ে ইসলামপ্রিয় মানুষের উপর সন্ত্রাসের অপবাদ দেয়। এই বক ধার্মিকেরা আল্লাহর দ্বীনকে নির্মূলের পদক্ষেপকে, আল্লাহর মুমিন বান্দাদের উপর বর্বরতা চালানোকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম বলে ফতোয়া জারি করতেও পিছপা হয় না। তারা মসজিদের পবিত্রতা নিয়েও মায়াকান্না প্রদর্শন করে এবং ধর্মপ্রাণ নামাযী মুসলমানদের নামেই মসজিদের পবিত্রতা বিনষ্টের অভিযোগ করে। মসজিদের নিরাপত্তা ও পবিত্রতা রক্ষার নামে মসজিদের উপর হিন্দু পুলিশ লেলিয়ে দেয়, বাইরে থেকে মসজিদের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালায়। মসজিদের পবিত্রতা মূলতঃ

তাদের দ্বারাই নষ্ট হয়, যারা গোয়েন্দাগিরি করা আর বিশৃঙ্খলা ঘটিয়ে নামায পন্ড করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যে মসজিদে যায় না; যারা মসজিদকে জেলখানা বানায়, বুট পরে মসজিদে ঢুকে কুরআন শরীফ ছিন্নভিন্ন করে। মুনাফিক নেতারা নিজেরা ইসলাম ও নামাযের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হওয়া সত্ত্বেও নিজেদের দলীয় কর্মীদের মসজিদে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। নামাজের নামে মসজিদে গিয়ে প্রকৃত নামাজীদের নামাজে বিঘ্ন ঘটানোর প্রবণতা মক্কার কাফেরদের মধ্যেও বর্তমান ছিল। এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে, "আর কাবার নিকট তাদের নামায বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরীর আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।" (সূরা আনফালঃ৩৫) মুনাফিক শাসকরা একদিকে জনগণকে ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালায়, অপরদিকে জনগণ যখন নিজেদের দ্বীন-ঈমান রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে তখন জনগণকে নিবৃত্ত করার জন্য ইসলামের আদব-কায়দা, শাসকের আনুগত্য ইত্যাদি বিধানের দোহাই দিয়ে সরকারের বিরোধিতাকেই ইসলামের বিরোধিতা এবং সরকারের আনুগত্যকেই আল্লাহর আনুগত্য বলে প্রমাণ করতে চায়। ইসলামের প্রতি বৈরী আচরণের ফলশ্রুতিতে মুনাফিকরা যখন ইসলামপ্রিয় জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তখন আবার ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশায় ইসলামের জন্য দরদে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এতদুদ্দেশ্যে তারা নির্যাতিত কোন মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি দরদী সেজে সে ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বনের জন্য মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে আর দাবি করে যে, তারা ক্ষমতায় থাকলে মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করত। নিজেরা মনেপ্রাণে ইসলাম ও মুসলমানের অনিষ্টকামী হয়েও মুসলিম নেতৃবৃন্দের সামান্য ভীরুতা ও অসহায়ত্বকে জব্দ করা ও অসন্তোষ সৃষ্টির সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ পরবর্তীতে তারাই আবার সেই মুসলিম নির্যাতনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে এবং নিজের দেশের মুসলমানদেরকেও নির্যাতনের লক্ষ্যবস্তু বানানোর জন্য সেই হানাদারদের কাছে আবদার পেশ করে। মুনাফিকরা ইসলামপন্থীদের নামে মুসলিম জনগণের কাছে অভিযোগ করে যে, দেখ তোমাদের মুসলিম ভাইদের উপর অত্যাচার হয় আর ওরা কোন প্রতিবাদ করে না। আবার বিধর্মী জালেমদের কাছে গিয়ে নালিশ করে যে, তোমরা যখন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছিলে, তখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ করেছিল। ইসলামের শত্রুদের কাছে মুসলিম সরকার ও জনগণের নামে সত্য-মিথ্যা এমনসব উস্কানীমূলক কথাবার্তা প্রচার করে, যা ইসলামবিরোধী শক্তিকে মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করবে ও আক্রমণ চালাতে প্ররোচিত করবে। তাদের এসব প্রচারণার ফলে বিধর্মীরা যখন মুসলমানদের উপর হয়রানিমূলক আচরণ শুরু করবে, তখন তারাই আবার মুসলমানদের জন্য মায়াকান্না শুরু করে দেবেঃ দেখ ইসলামী মুজাহিদরাই মুসলিম জাতির জন্য বিপদ ডেকে এনেছে; অতএব এদেরকে দমন করতে পারাটাই বিধর্মীদের কবল থেকে মুসলমানদের রক্ষা করার একমাত্র পথ। তারা বোঝাতে চায়, দুনিয়ায় মুসলমানদের উপর নির্যাতনের জন্য বিধর্মীরা কেউ মোটেই দায়ী নয়, বরং যারা ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষে লড়াই করে তারাই দায়ী। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনসমূহের মধ্যে যারা প্রতিরোধ সংগ্রামের মাধ্যমে শত্রুর হাত থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে চায়, তাদের সম্পর্কে এরা বলে, ইসলামী জঙ্গীরাই সন্ত্রাসী কার্যকলাপের দ্বারা মুসলমানদেরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিল। আর যারা কূটনৈতিক পন্থায় একটু বন্ধুত্ব ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের ক্রোধকে প্রশমনের মাধ্যমে রক্ষা পেতে চায়, তাদেরকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে আর বলে, এরাই শত্রুর সাহস বাড়িয়ে দিয়ে মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাবার সুযোগ করে দিল। পক্ষান্তরে যারা ইসলামের শত্রুদের মাঝে মুসলিমবিরোধী ক্রোধ ও উত্তেজনাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে দেশ-দেশান্তরে ছুটে বেড়ায়, মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন ও গণহত্যা শুরু করার জন্য একটা কিছু সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে চায়, ক্রুসেডারদের হাতে ক্রুসেডের বিস্তৃতি ঘটাবার কোন একটা উছিলা ধরিয়ে দিতে চায়, তারাই কিনা ইসলাম ও মুসলমানদের হেফাজতকারী! মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা কখনো মুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, আবার কখনো অমুসলিম নির্যাতনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। তবে উভয় ক্ষেত্রেই তারা ভুলেও কখনো কোন ইসলামবিরোধী শক্তিকে অভিযুক্ত করে না, বরং কোন না কোন ইসলামী শক্তিকেই সমালোচনার লক্ষ্যবস্তু বানায়। তদুপরি অমুসলিমদের ক্ষেপাতে গিয়েও তারা নিজেদের ইসলামবিদ্বেষী মনোভাবকে সরাসরি প্রকাশ করে না, বরং এক্ষেত্রেও তারা নিজেদেরকে যথাসম্ভব ইসলামের পক্ষে দেখানোরই চেষ্টা করে; আর মুসলিম শক্তিকেই ইসলামের অবমাননা ও ইসলামকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার দায়ে অভিযুক্ত করে এবং ইসলাম, গণতন্ত্র, দেশ ও মানবতার শত্রু হিসেবে আখ্যায়িত করে। তারা নিজেরা অমুসলিম জনগণের উপর নির্যাতন চালিয়ে হোক, কিংবা নির্যাতনের কল্পকাহিনী রচনা করে হোক, মুসলিম সরকার, ইসলামী সংগঠন ও মুসলিম জনগণকেই নির্যাতনকারী হিসেবে চিহ্নিত করে এবং ফতোয়া জারি করে যে, যেহেতু অমুসলিমদের উপর নির্যাতন চালানো ইসলামে নিষিদ্ধ, অতএব এরাই ইসলামবিরোধী। যারা ক্ষমতায় থাকাকালে জনগণের নামাজ-কালামে বাধা দেয়ায় চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি, তারাই আবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে ধর্মীয় কোন আচার-অনুষ্ঠানে যাবার ছলে ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারী আইন লংঘনপূর্বক বিবাদে লিপ্ত হয়ে সিন ক্রিয়েটের মাধ্যমে মুসলিম সরকারকে ধর্ম পালনে বাধাদানকারী হিসেবে আখ্যায়িত করে। এই সমস্ত মুনাফিক রাজনীতিবিদরা নিজেদেরকে ইসলামের সেবক আর ইসলামের সৈনিকদেরকে ইসলামের দুশমন হিসেবে প্রমাণ করার জন্য নিজেদের দলীয় কিছু তাবেদার ভন্ড আলেমকে ব্যবহার করে, যারা কুরআন-হাদীসের অর্থ বিকৃতি ও অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের বিপরীত অবস্থা প্রচারে বেশ পারদর্শী। কুরআন-হাদীসে ইসলামের শত্রুদের কার্যকলাপ, মুনাফিকদের প্রতারণা, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের ছলচাতুরী এবং ভন্ড আলেমদের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে সমস্ত বিবরণ ও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, সেগুলোকে এরা সুকৌশলে ইসলামী মুজাহিদ ও নিষ্ঠাবান আলেমদের উপরই আরোপ করে এবং বিস্ময়ের ভঙ্গিতে বলতে থাকেঃ দেখ দেখ, ১৪০০ বছর আগে অবতীর্ণ কুরআনের কথার সাথে এদের অবস্থা কী সুন্দর মিলে গেছে! অথচ কুরআন-হাদীসের এসব বিবরণ মূলতঃ সেসব আলেমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যারা ইসলামের প্রকাশ্য দুশমনদের সাথে সখ্যতা বজায় রেখে চলে, সত্যিকার ফাসাদকারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করে না, কাফেরদের মুসলিম নির্যাতনের কথাও উল্লেখ করে না-- করলেও তা করে কেবল মুসলিম মুজাহিদদের দোষারোপ করার উদ্দেশ্যে; আর বেছে বেছে শুধু ইসলামপন্থীদের মাঝেই কুরআন-হাদীসে বর্ণিত মুনাফিক ও ফাসাদকারীদের খুঁজে পায়। এককথায়, নিজেদের অনৈসলামিক নীতি-আদর্শ আর বিভেদ সৃষ্টিমূলক কর্মনীতিকে ইসলামের নামে চালিয়ে দিয়ে নিজেদেরকে ইসলামের খেদমতগার হিসেবে জাহির করা এবং প্রকৃত ইসলামের ধারক-বাহক ও নিষ্ঠাবান ইসলাম প্রতিষ্ঠাকামীদের ইসলামের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করাই মুনাফিকদের পলিসি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আজ বিধর্মী কাফেররাও ইসলামী শক্তির মোকাবেলায় ইসলামকে নিজেদের পক্ষে ব্যবহার করতে শুরু করেছে। তারা নিজেদের ভূমিকাকে ইসলামসম্মত আর ইসলামী মুজাহিদদের কাজকর্মকে অনৈসলামিক বলে প্রমাণ করতে চাচ্ছে এবং ইসলামী শক্তির মোকাবেলায় তাদের পক্ষ অবলম্বন করাকেই মুসলমানদের কর্তব্য বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। তারা ইসলাম গ্রহণ বা ইসলামের অনুসারী হবার ঘোষণা না দিলেও নিজেদেরকে ইসলামের পৃষ্ঠপোষক ও কল্যাণকামী এবং ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল ও সহনশীল বলে দাবি

করে। নিজেদেরকে ইসলামের দরদী প্রমাণের জন্য তারা তাদের নিজেদের দেশের মুসলিম জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করে। ইসলামের প্রতি নিজেদের সহনশীলতা প্রমাণের জন্য তারা এমনকি নিজেদের সেনাবাহিনীতেও ইমাম নিয়োগ করেছে, যারা মুসলিম সৈন্যদের নামাজ পড়ায়, নামাজ শিখায় এবং কুরআন শিক্ষা দেয়। একজন মুসলমান যার কাছে আল্লাহর দ্বীন শিখবে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি একটা আস্থার ভাব সৃষ্টি হবে এবং সেরূপ অবস্থায় যেকোন ব্যাপারে তার নির্দেশ ও ফয়সালাকে ইসলামেরই বিধান মনে করে শিরোধার্য করে নেবে। এ ব্যাপারটা ইসলামের শত্রুরা জানে বিধায় ঐ ইমামদেরকে দিয়ে মুসলিম বিশ্বের কিছু স্বনামধন্য আলেম ও ইসলামী চিন্তাবিদের কাছ থেকে এই মর্মে ফতোয়া যোগাড় করিয়ে দেয় যে, দেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ, স্বদেশের বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টিকারীদের মোকাবেলা করা ঈমানী দায়িত্বেরই অংশ, 'সন্ত্রাসবাদীদের' দমন করা ইসলামেরই নির্দেশ ইত্যাদি। এর মাধ্যমে মুসলমানদের আস্থা, বিশ্বাস ও আনুগত্য অর্জন করে তাদেরকে নিজেদের পক্ষে ও মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যবহার করতে চায়। একজন মুসলমানকে সবরকম ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েও যদি তাকে অপর কোন মুসলিম ভাইয়ের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, সেটাই ইসলামের শত্রুদের পক্ষে অধিক লাভজনক। কারণ, এক মুসলমান যখনই তার কোন মুসলিম ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে অগ্রসর হবে, তখন তার দ্বীন-ঈমান এমনিতেই বরবাদ হয়ে যাবে-- সে যত এবাদত-বন্দেগিই করে থাকুক না কেন। এছাড়া মুসলমানদের বিভ্রান্ত করে তাদের আনুগত্য হাসিলের জন্য তারা আরো যেসব পদক্ষেপ ও কৌশল হাতে নিয়েছে তার মধ্যে রয়েছে রোযা ও ঈদ উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের মুসলমানদের প্রতি শুভেচ্ছা জানানো, মুসলিম নেতা ও প্রতিনিধিদের দাওয়াত দিয়ে ইফতার খাওয়ানো ইত্যাদি। নিজেদেরকে ইসলামের খেদমদগার হিসেবে পেশ করার পাশাপাশি ইসলামের রক্ষকদেরকে ইসলামের যম হিসেবে তুলে ধরার জন্য তারা নানারকম প্রচারণা চালায়। যাদেরকেই ইসলামের প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসতে দেখে, তাদেরকেই তারা সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করে। ইসলামের সৈনিকদেরকে সন্ত্রাসী প্রমাণের জন্য তারা দুই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করে-- মজলুমের আত্মরক্ষার প্রয়াসকে সন্ত্রাস বলে অভিহিত করা কিংবা অন্য কারো সন্ত্রাসী কাজের দায়ভার মুসলমানদের উপর চাপানো। এভাবে তারা ইসলামী বিপ্লবীদেরকেই সন্ত্রাসবাদী সাব্যস্ত করে এবং কথিত সন্ত্রাসবাদের অভিযোগকে কেন্দ্র করে প্রচার চালায় যে, সন্ত্রাসবাদ যেহেতু অনৈসলামিক, ইসলাম যেহেতু সন্ত্রাসবাদবিরোধী, আর ওরাই যেহেতু সন্ত্রাসবাদী, তাই ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করাটা যেন ইসলামী জিহাদেরই অন্তর্ভুক্ত। তারা বলে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়তে আসেনি, যারা ইসলামকে অপমান করেছে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছে। ভাবখানা এই, যেন ইসলামকে সম্মানিত করতেই এরা এগিয়ে এসেছে। ইসলাম যাদেরকে লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত বলে ঘোষণা দিয়েছে, তারাই কিনা ইসলামের সম্মান উদ্ধার করতে এসেছে। তারা স্বজাতির লোকদেরকে বুঝায় যে, ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাসের ধর্ম। ইসলাম মানেই সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসবাদ মানেই ইসলাম; মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, সন্ত্রাসী মানেই মুসলমান। অতএব, ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে খ্রীস্টধর্মের পতাকাকে সমুন্নত করার জন্যই মুসলিম মুজাহিদদের মোকাবেলায় খ্রীস্টান ক্রুসেডারদের ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের বুঝ দিতে গিয়ে বলে যে, ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। এ ধর্মে সন্ত্রাসের কোন স্থান নেই। যারা সন্ত্রাস করে, মানে ঐ ইসলামী মুজাহিদরা, ওরা আসলে মুসলমানই নয়। ওরা শুধু ইসলামের নাম ব্যবহার করে, আসলে ইসলাম ধর্মকে বিশ্বাসই করে না। ওরা আসলে ইসলামের অবমাননাই করছে। অতএব, ওদের হাত থেকে তোমাদের ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা উদ্ধারের জন্য তোমাদেরকে আমাদের সাথেই হাত মেলাতে হবে। আমরা তো ইসলামের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসিনি, বরং আমরা লড়াই করতে এসেছি তাদের বিরুদ্ধে, যারা ইসলাম ধর্মকে অপমান করেছে। আমরা তোমাদের ধর্মকে ধ্বংস করতে আসিনি, বরং উদ্ধার করতে এসেছি। এরা স্বজাতির কাছে বলে এটা আমাদের ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। আর মুসলমানদের কাছে বলে এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, এ যুদ্ধ কেবল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রতারক নেতারা কারো কাছেই সত্য কথা বলছে না। স্বজাতির কাছে তারা ইসলামের প্রতি শত্রুতা প্রকাশ করলেও ইসলাম সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যার অবতারণা করছে। আর মুসলমানদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে ইতিবাচক কথা বললেও ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতা গোপন রাখছে এবং ইসলামের সৈনিকদের সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে ইসলাম শান্তির ধর্ম একথাও ঠিক এবং তারা তা জেনেশুনেই ইসলামের সাথে শত্রুতা করে। ব্যাপারটা আরো খোলাসা করে বলতে গেলে বলতে হয়, মূলত ইসলাম শান্তির ধর্ম হওয়ার কারণেই তারা ইসলামকে নির্মূল করতে চায়, কারণ তারা নিজেরা অশান্তির পক্ষে এবং ইসলামী মুজাহিদরা তাদের সৃষ্ট অশান্তি দূর করে শান্তি স্থাপন করতে চায় বলেই তাদের এত আক্রোশ। ধর্ম, রাজনীতি, সন্ত্রাসবাদ, শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে তারা মুখে এমন কথা বলে যা অন্তরে বিশ্বাস করে না। আর তারা মুজাহিদ নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলে, আপনারা সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য এমন কোন ধর্মকে ব্যবহার করবেন না, যা নিজেই বিশ্বাস করেন না। মানুষ আসলে নিজের আয়নায় অন্যকে বিচার করে। ধর্মে অবিশ্বাসী হয়েও ধর্মকে সন্ত্রাস সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা মূলতঃ তাদেরই স্বভাব। মুসলমানদের কাছে কে সত্যিকার মুসলমান, আর কে মুসলমান নয় সেই সার্টিফিকেট দেয়ার এজেন্সি নিয়ে বসেছে বিধর্মী কাফেররা। যারা তাদের ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী কার্যকলাপে সহযোগী, সমর্থক বা সহনশীল ভূমিকা পালন করে, তারাই তাদের ভাষ্যমতে সত্যিকার মুসলমান। আর যারা তাদের সর্বনাশা হিংস্র থাবা থেকে ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, তারাই তাদের ভাষায় 'ইসলামের নামে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী'। সামগ্রিকভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করাই যে ইসলামের শত্রুদের উদ্দেশ্য, একথা তারা কেউই সহজে স্বীকার করতে চায় না। ইহুদী-খ্রীস্টান সাম্রাজ্যবাদী পরাশক্তি থেকে শুরু করে মুসলিম নামধারী মুনাফিক শাসক পর্যন্ত সকলেই দাবি করে যে, তারা কেবল কতিপয় মৌলবাদী, ধর্মব্যবসায়ী ও সন্ত্রাসবাদীদেরকেই দমন করতে চায়, আসল ধর্মের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। আর আসল ধর্ম বলতে তারা নিজেদের মনগড়া নির্দেশনাকেই বুঝায়, যা তাদের খোদাদ্রোহী শাসন ও শয়তানী কার্যকলাপের প্রতি মানুষের সমর্থন বা মৌনতা অবলম্বন নিশ্চিত করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা ইসলামের শান্তি ও সহিষ্ণুতার নীতিকেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা নিজেদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে নিয়ে যায় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে।

(৩) ইসলাম প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের দ্বীন-ঈমানের উন্নতি সাধনের নামেই এমন কাজ করা যাতে ইসলাম তথা মানুষের দ্বীন-ঈমান বিপন্ন হয়ঃ মুনাফিকরা মানুষকে ইসলামের পথে আনা এবং মানুষের দ্বীন ও ঈমানে অগ্রগতি সাধনের নামে মানুষকে ইসলামের পথ থেকে সরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে। এ উদ্দেশ্যে তারা কখনো ইসলামকে কঠিন করে তোলার মাধ্যমে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি অভক্তি সৃষ্টির প্রয়াস চালায়, আবার কখনো বা ইসলামকে সহজ করার নামে মানুষের দ্বীন পালনের উপর কাটছাট আরোপ করে। এছাড়া কোন কোন সময় তারা নিজেদের এবাদত-বন্দেগির পথকে কন্টকমুক্ত করার নামে মানুষের উপর দুর্ব্যবহার করার মাধ্যমে ইসলামের প্রতি ভুল-বুঝাবুঝি সৃষ্টির প্রয়াস চালায়। তারা কখনো মানুষকে দ্বীন শিখানোর নামে, আবার কখনো বা নিজেরা এবাদত-বন্দেগি করার নামে জুলুম-নির্যাতনের আশ্রয় নিয়ে আল্লাহর এবাদত তথা দ্বীন ইসলামের ভাবমূর্তি

বিনষ্ট করার প্রয়াস চালায়। তারা ধর্ম পালনে নিজেদেরকে নিষ্ঠাবান প্রমাণের জন্য ঈমানদার মুসলমানদেরকেই নিজেদের এবাদতের পথে বাধারূপে চিহ্নিত করে এবং সেই বাধা দূর করার নামে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করে। এর মাধ্যমে ঈমানদারদের প্রতি শত্রুতা সাধনের কাজটিও সম্পন্ন হয় এবং আল্লাহর এবাদতের প্রতি মানুষের মনে ভুল ধারণাও সৃষ্টি করা যায়। হাদীসে আছে, "দুইটি গুণ কোন মুনাফিকের ভিতর একত্রে পাওয়া যাবে না-- সদ্ব্যবহার এবং ধর্মভাব।" (তিরমিযী) অতএব, ধর্মের নামে মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করাটা মূলতঃ মুনাফিকদেরই কাজ এবং এর দ্বারা ধর্মকে ভ্রান্তির বেড়াজালে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য। ইসলামকে নিষ্ঠুরতার কারণ হিসেবে দেখানোর জন্য তারা কখনো ইসলামের নামেই মানুষের উপর নিষ্ঠুর আচরণ করে, আবার অনেক সময় সরাসরি ইসলামের নামে নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন না করলেও একদিকে ধর্মকর্ম পালন করা এবং করানোর মাধ্যমে ধর্মভাব প্রদর্শন করে, অপরদিকে কথায় কথায় মানুষের উপর নির্যাতন-নিষ্পেষণ চালিয়ে নির্দয়ভাব প্রদর্শন করে। এভাবে নিষ্ঠুরতা আর ধর্মাচরণ দুটো জিনিস পাশাপাশি চালিয়ে ইসলামকে নিষ্ঠুরতার ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়। তবে যদি কখনো বাস্তবেই মানুষের নৈতিক চরিত্র রক্ষার জন্য কঠোর শাসনের প্রয়োজন হয়ে দাড়ায়, তখন হয়ত মুনাফিকরা উদারতার নামে প্রশ্রয়দানের মাধ্যমে নৈতিক অবক্ষয়কে জিইয়ে রাখার প্রয়াস চালাবে এবং সংশোধনকামীকে অকল্যাণকামী ও ছিদ্রান্বেষী হিসেবে চিহ্নিত করবে।

(৪) প্রকাশ্যভাবে ইসলামের প্রতি আনুগত্য ও মানুষের দ্বীন-ঈমানের প্রতি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রদর্শন এবং গোপন চক্রান্ত ও তৎপরতার মাধ্যমে ইসলাম তথা মানুষের দ্বীন-ঈমানকে বরবাদ করাঃ মুনাফিকরা তাদের প্রকাশ্য অযুহাত, টালবাহানা, ওজর-আপত্তি কিংবা বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা ও ছলনাপূর্ণ আচার-আচরণের দ্বারা যখন মানুষকে কোনভাবেই দ্বীন থেকে বিচ্যুত করতে না পারে, তখন তারা আমাদের দ্বীনী কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, আল্লাহর দ্বীনের একনিষ্ঠ সেবকের ন্যায় আচরণ শুরু করে; যাতে জনগণ মনে করে যে, তাদের হাতকে শক্তিশালী করতে পারলেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। উপরে উপরে দ্বীনের প্রতি কো-অপারেটিভ ও বন্ধুভাবাপন্ন সেজে তলে তলে দ্বীনকে বরবাদ করার জন্য এমন সূক্ষ্ম চক্রান্তের জাল বিছিয়ে দেয় যা কোন ঝানু পর্যবেক্ষকের আণুবীক্ষণিক দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে না। আল্লাহর পথে সাহায্য করার কাজে তারা এগিয়ে আসে প্রকাশ্যে, আর আল্লাহর পথে বাধাদানের কাজ তারা চালিয়ে যায় নীরবে, নিঃশব্দে। মানুষকে আল্লাহর এবাদত করতে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তারা নিজেরা সশরীরে হাজির হয়, আর মানুষকে আল্লাহর এবাদত থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে তারা মুসলমানদের মধ্য থেকেই কিছু ভীরু, অসহায়, দুর্বলচিত্ত, স্বার্থপর, বিশ্বাসঘাতক, অপদার্থ, আত্মবিক্রীত ও গোলামী স্বভাবের লোককে নিয়োজিত করে নিজেরা বসে থাকে পর্দার আড়ালে। মানুষের সামনে নিজে একা আনুকূল্য প্রদর্শন করে, আর পিছনে দশজনকে বিঘ্ন সৃষ্টির কাজে লাগিয়ে দেয়। তাদের নির্ভুল ব্লু-প্রিন্ট ও নিখুঁত কারসাজির ফাঁদে পা দিয়ে মুসলমানরাই একে অপরকে অসৎ কাজে সহযোগিতা আর সৎ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখার কাজে লিপ্ত হয়। মুনাফিকরা মুসলমানদের দিয়েই মুসলমানদের ধর্মপালনের উপর হয় সরাসরি বাধা প্রদান বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করায়, কিংবা ধর্ম পালন করানোর নামে জবরদস্তি করায়। কেউ মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর যদি ধর্ম শিখানোর নামে নির্যাতন ও জবরদস্তি করে, তাহলে তো মানুষ বুঝে ফেলবে যে, সে আসলে ধর্মকে নষ্ট করতে চাচ্ছে। এর চেয়ে বরং কোন মুসলমানকে দিয়ে যদি ধর্মের নামে অসদাচরণ করানো যায়, তাহলে মানুষ মনে করবে ধর্মের জন্যই এসব হচ্ছে, অতএব ধর্মটাই ভোগান্তির মূল। মুসলমানদের মধ্যে যারা মানুষকে মারপিট করে দ্বীন শিখাতে চায়, মুনাফিকরা তাদের প্রতিই সমর্থন ঘোষণা করে। আর যারা আদর করে দ্বীন শিখাতে চায়, তাদেরকে ব্যর্থ, অযোগ্য ও অক্ষম সাব্যস্ত করে দূরে সরিয়ে রাখার প্রয়াস চালায়। আমরা যখন পথ চলতে গিয়ে তাদের পাতা জালে আমাদের পা আটকে যায়, তখন তা বোঝা যায়, অনুভব করা যায়, কিন্তু কোন প্রকাশ্য ও উপস্থিত ইস্যু না পাওয়ায় কোন ধরনের পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভবপর হয় না। সম্ভব সবরকম কৌশলে মানুষকে দ্বীন-ঈমান ও এবাদত-বন্দেগি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা সত্ত্বেও তারা বরং মানুষের কাছে এটাই প্রমাণ করতে সক্ষম হবে যে, আমরা তো মানুষকে দ্বীনের পথে চালাতে সহযোগিতার কোন ত্রুটি করি না, কিন্তু মানুষ যদি আমাদের সাহায্য গ্রহণ না করে, আমাদের কথা না শোনে, আমাদের কিইবা করার আছে। মানুষের কাছে ঈমানদার হিসেবে স্বীকৃতি পাবার জন্য সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা এবং সেই সহযোগিতাও যেন বাস্তবে কোন কাজে না আসে সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারা যে কত বড় দক্ষতা তা বলাই বাহুল্য। এককথায়, নিজেরা দ্বীনের প্রতি চরম বিদ্বেষী এবং মানুষের দ্বীন-ঈমান বরবাদকারী হয়েও জনগণের কাছে নিজেদেরকে পাক্কা দ্বীনদার এবং মানুষের দ্বীন-ঈমানের হেফাজতকারী হিসেবে প্রমাণ করাটাই মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের কতিপয় মুনাফিকের সম্পর্কেই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে বলেছিলেন, "কোন কোন গ্রাম্য লোক হচ্ছে মুনাফিক, আর শহরবাসীদের মধ্যেও কেউ কেউ রয়েছে মুনাফেকিতে পাকাপোক্ত। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি।" (সূরা তওবা) ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, "এরা কপটতায় অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে এবং তাতে কট্টর হয়ে গিয়েছে। এরা কপটতায় এতই অভিজ্ঞ যে, আপনার পক্ষে তাদেরকে জানা-চেনা সম্ভব নয়, অনেকের পক্ষেই তাদের মুনাফেকি বোঝা সম্ভব নয়। আমরা কিন্তু তাদেরকে চিনি--জানি, সুতরাং তাদের সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করব।" এদের কথাবার্তা, চালচলন ও পোশাক-আশাক দেখলে পাক্কা মুমিন-মুত্তাকী বলেই মনে হয়, অথচ বাস্তবে এরা মানুষের দ্বীন-ঈমান ও চরিত্র-সতীত্ব বিনষ্ট করার জন্যই নিবেদিতপ্রাণ। এসব মুনাফিক ব্যক্তিবর্গ ধর্মীয় কাজে মুসলমানদের সাথে শামিল হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় ব্যাপার তথা মাসলা মাসায়েল যেমন নামায-রোযা কিসে সহীহ হবে আর কিসে তা নষ্ট হবে ইত্যাদি ব্যাপারে মূল্যবান পরামর্শ ও উপদেশ দিয়ে সহযোগিতাও করে, যার ফলে মনে হয় যে, এরা আমাদেরই একজন। মানুষকে বিপথগামী করার ক্ষেত্রে এই ধরনের মুনাফিকরা সরাসরি কোন মন্দ কাজের নির্দেশ দানের পরিবর্তে তিলে তিলে মানুষকে মন্দ হিসেবে গড়ে তোলে। ফলে কখনো কারো দ্বারা কোন দুর্ঘটনা ঘটলেও তাদেরকে হুকুমের আসামী করা যায় না। বরং এরা অনেক সময় নিজের বখে যাওয়া ছেলেকে পুলিশে দিয়ে মানুষের কাছে ন্যায়পরায়ণ হিসেবে প্রশংসাও লাভ করে থাকে। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সকল প্রকার ফেতনা ও অনিষ্টের নেপথ্য নায়ক হয়েও বাহ্যিক আনুগত্য ও ছলচাতুরীর বদৌলতে এরা ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণকামী ও ত্রাণকর্তা হিসেবে সকলের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়।

উপসংহারঃ আমাদের আলোচনা থেকে আমরা এ মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, ইসলামের শত্রুরা স্থান, কাল ও পাত্রভেদে ভোল পাল্টায় ও নীতি পরিবর্তন করে। তাদের এ কৌশল সম্পর্কেই আল কুরআনে বলা হয়েছে, "সে পার্শ্ব পরিবর্তন করে বিতর্ক করে, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দেয়। তার জন্যে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা আছে এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন-যন্ত্রণা আস্বাদন করাব।" (সূরা হজ্জঃ৯) অর্থাৎ, একেক সময় একেক ধরনের অযুহাত ও বাহানায় মানুষের মনে আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই এসব মানুষের উদ্দেশ্য।